নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১২, পৃ : ৩৩-৪৫
২০০৭ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নারীর 'ক্ষমতায়ন' ও আইনী সহায়তার ডিসর্কোস[১]

নাসরিন নাহার*

১. ভূমিকা

জ্ঞানকান্ড হিসেবে আইনের উদ্ভব এবং বিকাশ বহু প্রাচীন। সংজ্ঞা রূপে বলা যায় "আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক রচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর প্রযুক্ত আদেশ" (অষ্টিন:১৮৩১)। আইনের সুনির্দিষ্ট আদেশ সমাজে বাস্তবায়ন করতে সরকারী এবং বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। আইনী আদেশ বাস্তবায়ন 'উন্নয়ন' পরিভাষায় একভাবে 'আইনী সহায়তা প্রদান' নামে হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে আইন কাঠামোর আওতায় আইনী সহায়তা প্রদানে সরকারী, বেসরকারী পর্যায়ের যে এজেন্ডা তা একটি নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির সাথে কতটুকু সম্পর্কিত এবং আইনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নারীর 'ক্ষমতায়ন', 'অধিকার অর্জন বিষয়টিও সমাজ সংস্কৃতিতে কিভাবে সংশ্লিষ্ট তা 'আইনী নৃবিজ্ঞান' ধারণার মাধ্যমে এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে।

বাংলাদেশে মূলধারার আইনী চর্চার মাধ্যমে বেসরকারী আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে নারীর 'ক্ষমতায়ন'[২] তথা 'অধিকার রক্ষায় আইনী' ভূমিকার কথা বলেন তা 'আইনী নৃবিজ্ঞান' এর পর্যালোচনা থেকে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। আইন কি পরিমাণগত কোন বস্তু যা দেবার মাধ্যমে কোন নারী 'ক্ষমতায়িত' হন বা কারোও অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়ে থাকে যা এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা। প্রবন্ধটির দ্বিবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত: 'আইনী নৃবিজ্ঞানের' দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করা। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশে আইন কিভাবে যান্ত্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীর অধিকারকে সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চায় তা কতক কেইসের মাধ্যমে তুলে ধরা। আইন যেভাবে একটি অনড়, অপরিবর্তনীয় এবং যান্ত্রিক ভাবে সমাজ-সংস্কৃতিকে পরিচালনা করে থাকে তার বিপরীতে নৃবিজ্ঞানীরা সমাজ, সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত প্রথাসমূহকে অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনী মর্যাদা দিতে চান।

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইল ঃ nasrin_nahar85@yahoo.com

প্রবন্ধটি আলোচনার সুবিধার্থে ভূমিকা ও উপসংহার বাদে চার অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে 'আইন' সম্পর্কিত ধারণা দেবার পাশাপাশি 'নৃবৈজ্ঞানিক আইন' জ্ঞানকান্ডের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়েছে। আইন সম্পর্কিত আলোচনায় 'ক্ষমতায়ন' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশ আলোচনা করা হয়েছে আমার একটি মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণার উপাত্তের উপর ভিত্তি করে। এই উপাত্ত সমূহ সংগ্রহিত হয়েছে দেশীয় তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' (আসক), 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট'(ব্লাস্ট) এবং 'নারীপক্ষ' থেকে, যারা আইনের মাধ্যমে নারীর 'ক্ষমতায়নের' দাবী করে। প্রবন্ধের সর্বশেষ অংশে কেইসস্টাডি গুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'ক্ষমতায়নের' আইনগত স্বরূপ 'আইনী নৃবিজ্ঞান' ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আইনের অবস্থান বোঝার তাগিদ থেকে আইন সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তি অংশে করা হবে।

২. আইন কি?

আইনকে বুঝতে হলে আইন বিদ্যার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও চর্চার ক্রমবিকাশের আলোচনা জরুরী। আইনের ধারণার ঐতিহাসিক মতবাদী হিসেবে স্যার হেনরি মেইন (১৮৬১), মেটল্যান্ড, স্যার ফ্রেডারিক পোলক (১৮৬১:৫৬) উল্লেখযোগ্য। তাদের মতে, আইন প্রকৃতির নির্দেশ ঈশ্বরের ইচ্ছা কিংবা সার্বভৌম শক্তির আদেশ নয় বরং আইন দীর্ঘ সমাজ বিবর্তনের ফল। পরবর্তীতে জন অস্টিন ১৮৩২ সালে, আইনকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন। তবে জেরেমী বেনথাম ১৮২৯ সালে বলেন, সার্বভৌম আদেশ হচ্ছে আইন।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণ এরিষ্টটল (১৬৫৩), হবস (১৫৮৮), লক (১৬৩২), মনন্টেস্কু (১৭২১), কোঁৎ (১৮৩৯), প্রাকৃতিক আইনের[৩] ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। ধর্মও আইনের এক প্রাচীন উৎস। আদিম সমাজের আইন ও প্রথাসমূহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এছাড়াও প্রাচীন গ্রীস রোমের অধিকাংশ আইনই ছিল ধর্মভিত্তিক। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুশাসন কালক্রমে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আইনগত আলোচনায় অন্যতম বিষয় ছিল প্রথাগত আইন (customary law) যা মূল আইনতত্ত্বের ধারণার রূপান্তর ঘটায়। সর্বপ্রথম প্রথাগত আইন লোকজ আইন (folk law) রূপে পরিচিত ছিল যেখানে আইনী আলোচনায় বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকদের অপেক্ষা ম্যালিনস্কির[৪] প্রভাব ছিল দৃঢ়। ম্যালিনস্কি কাঠামোগত ক্রিয়াবাদের আলোকে সমাজ কাঠামোর সাথে আইনকে সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে

বলে মনে করেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইনের যে সার্বজনীনতা, তা উপনিবেশিক শাসক কর্তৃক রচিত, ফলে ব্যক্তি বিশেষের 'অধিকার' রক্ষায় আইনের যে বাধ্যবাধকতা তা কতটুকু ব্যক্তির স্বার্থে কাজ করে থাকে, ম্যালিনস্কি তার উপর জোর দেন। বাংলাদেশের[৫] আইনী বিচার ব্যবস্থা এখনও উপনিবেশিক নিয়মনীতি দ্বারা 'সংরক্ষিত', যার উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং বর্তমান অবস্থান উত্তর-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বোঝা জরুরী (নাসির উদ্দীনঃ ২০০৪,১৩৭)। নৃবিজ্ঞানীরা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই সামাজিক প্রথা, আচার-আচরন, মূল্যবোধ সমাজে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (customary law) তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আইনবিদরা যেখানে 'আইনকে' নির্দিষ্ট সমাজের প্রচলিত নিয়মকানুনকে টেক্সট হিসেবে দেখতে আগ্রহী, নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহ সমাজ অভ্যন্তর থেকে গড়ে ওঠা প্রথা ও মূল্যবোধকে 'আইন' হিসেবে দেখা। অনেকটা 'টেক্সচুয়্যাল-প্র্যাকটিস' হিসেবে আইনের ব্যাখ্যা 'আইনী নৃবিজ্ঞানের' প্রধান উপযোগ্য বিষয়। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আইনী নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিকাশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. আইনী নৃবিজ্ঞানের বিকাশ

আইনী নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো সংস্কৃতির সম্পূর্ণ (holistic) ধারণাকে দেখা যেখানে 'সংস্কৃতি' হলো সামাজিক জীবন বিধি, বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতির চর্চা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, জ্ঞাতিসম্পর্ক, জীবনচক্র, আইন এবং রাজনীতির সংযুক্ততাকে বোঝা। মনটেস্কু ও হেনরি মেইন যথাক্রমে ১৭২১ ও ১৮৬১ সালে আইনী নৃবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো এবং এরিষ্টটল সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক আইন (natural law) এর ধারণা দেন। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে রেঁনেসা উত্তর দার্শনিকেরাও প্রাকৃতিক আইনের কথা বলেন। তাদের মতে, আইন সমাজকে পরিচালনা করে সার্বজনীন অধিকাররূপে। স্যার হেনরি মেইনকে[৬] 'আইনী নৃবিজ্ঞানের' প্রবর্তকরূপে স্বীকার করা হয়। মেইন (১৮৬১) তিনটি পর্যায়ে আইনী মডেলের ধারণা দেন। তাঁর মতে প্রথম পর্যায়ে মানুষ ভাবত যে, 'আইন' ঈশ্বর প্রদত্ত কোন বিষয় এবং এটি পরিচালিত হয় বিশ্বের নেতা পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ডের মাধ্যমে। মেইন এই পর্যায়কে মর্গানের (১৮৭৭) স্তর বিভাজনের 'বণ্যদশা' (savage) স্তরের সাথে তুলনা করেন। মেইন তাঁর বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'আইনকে' প্রথা হিসেবে দেখার প্রতি ইঙ্গিত দেন। এই পর্যায়টি মর্গানের স্তরের 'বর্বরদশা' (barbarism) ধাপের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ। মেইনের বিশ্লেষণের শেষ স্তরে 'আইনকে' মনে করা হতো পশ্চিমা সমাজের প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র কোন বিষয় যার নিজস্ব রীতি নীতির ধরন ছিল। মেইনের বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিবর্তনবাদী; পর্যায়গুলো ছিল বিবর্তনিক। কেননা তিনি মনে করেন আইনের

প্রথম দুটি পর্যায় পার হবার পরেই শেষ বা চূড়ান্ত পর্যায় আসে যখন সমাজ 'সভ্য' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মেইন বলেন যে, প্রয়োজনের তাগিদে আইনের রূপ বদলায় আবার নতুন আইনেরও সৃষ্টি হয়। ন্যায় বিচারের দ্বারা সৃষ্ট আইন এক প্রকার বিচারক সৃষ্ট আইন। সে সময় আইনী নৃবিজ্ঞানীরা এ্যাংলো আমেরিকান আইনী ধারণায় অ-পশ্চিমা সমাজগুলোকে দেখবেন কিনা, তা নিয়ে বির্তক শুরু হয়। সেক্ষেত্রে পল বোহানান এবং ম্যাক্স গ্ল্যাকম্যানের কাজ উল্লেখযোগ্য। বোহানান বিশ্বাস করেন বৈশ্বিক আইনী ক্যাটাগরির মাধ্যমে ভিন্ন সংস্কৃতিকে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি স্থানীয় (native) আইনী ধারণাকে এ পর্যায়ে ব্যবহার করতে বলেন। পরবর্তীতে গ্ল্যাকম্যান ও বোহানানের সাথে একমত পোষণ করেন (১৯৬৯:৩৮৯ - ৪০১)। তিনি মনে করেন নৃবিজ্ঞানীরা চান আইনজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজকে ব্যাখ্যা করতে।

আধুনিক নৃবৈজ্ঞানিক আইনের সূচনা করেন ব্রনসলি ম্যালিনস্কি। ট্রবিয়ান্ড সমাজের উপর তাঁর মনোগ্রাফ Crime of the Savage Society প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। ম্যালিনস্কি, মেইনের কাজের সমালোচনা করেন। তিনি আইনকে বোঝার জন্য গবেষণা কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ এবং মাঠকর্মের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি দৈনন্দিন জীবনে প্রথাভিত্তিক নিয়মকানুনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের আলোকে আইনী ব্যবহারের যৌক্তিকতা দেখান। ম্যালিনস্কি নিবিড়ভাবে স্থানীয় জীবনে 'নাগরিক আইন' এবং 'অপরাধ আইনকে' পর্যবেক্ষণ করেন[৭]। তিনি স্থানীয় জনগণের মধ্যে খুন, চুরি, মন্দ যাদুর নানা ধরণ রয়েছে বলে উল্লেখ করে বলেন যে, স্থানীয় জনগণের জীবনের আলোকে আলোচনার মাধ্যমেই তা বোঝা সম্ভব (১৯২৬;২১)।

ই.এ. হোবেল (E.A Hobel) তাঁর 'The Law of Primitive Man' গ্রন্থে মানব জীবনের জটিলতা ও নির্দিষ্টতার কথা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে ১৯৫০,'৬০ এর দশকে 'আইনী নৃবিজ্ঞানীরা' সামাজিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে আইনী কর্তৃত্বকে চিহ্নিত করেন (১৯৫৪;১২)। ৭০'র মাঝামাঝি থেকে '৮০'র দশকে যুক্তরাষ্ট্রের আইন সম্পর্কিত এথনোগ্রাফির ব্যাখ্যায় মুর (১৯৭৮) দেখান যে তখন সামাজিক বিরোধ মীমাংসায় কোর্টের ব্যবহার বেড়ে যায়। ফলে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে আইনী ডিসকোর্সকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। '৭০ এর দশকে আইনী নৃবিজ্ঞান কেবল নিয়মনীতি (rules) না প্রক্রিয়াধর্মী (process) হবে তা কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে। কমাররফ এবং সিমন (comaroff and simon) ১৯৮১ সালে আইনী নৃবিজ্ঞানে যে কোন দ্বন্দ্ব মীমাংসায় সামাজিক প্রথা নির্ধারণের দিকে গুরুত্ব দেন। তার মতে, 'আইনী দর্শন পশ্চিমা মান নির্ধারকের গদবাধা ফল। 'আইন' (law) এবং 'বিষয়'

(fact) 'আইনবিদ' এবং 'নৃবিজ্ঞানীদের' কেন্দ্রীয় চিন্তার জায়গা, সমাজে এ দুয়ের সম্মেলনের মাধ্যমে আইনী নৃবিজ্ঞানকে বোঝা সম্ভব। কেইস আলোচনায় 'আইন' বৈশ্বিকভাবে কোন ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির আলোকে প্রকাশ করে না কি এ্যাংলো আমেরিকান আইনী মূল্যবোধের প্রতিবিম্ব ব্যক্তি জীবনে প্রকাশ পায় তা বোঝার দিকে গিয়ার্টজ (১৯৮৩: ১৬৯- ১৭০) নজর দিতে বলেন।

'আইনী নৃবিজ্ঞানের' স্বরূপ আলোচনায় রিচার্ড উইলসনের[৮] (১৯৭৯) মতে: "একটা সংস্কৃতির মধ্যে নানা প্রকারের নৈতিক ইস্যু থাকে তা নিয়ে অন্য সমাজের আলোচনা করা উচিৎ নয়। কেবলমাত্র অধিকার রক্ষায় কিছু আইন ও এর প্রয়োগ কিভাবে একজন মানুষকে ক্ষমতাশীল করবে তা ভাববার বিষয়"। ১৯৮০ হতে ১৯৯০ এর দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে 'নৃবৈজ্ঞানিক আইনী' জ্ঞানকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সেক্ষেত্রে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব অধ্যয়নে 'আইন' কে 'ক্ষমতার' সাথে সম্পর্কিত করে দেখার কথা বলা হয়। অন্যকথায়, আইন যে 'ক্ষমতার' অন্যতম রূপ তা বোঝা জরুরী (starr and collier;1989)। পরবর্তীতে, '৯০ 'এর দশকে দৃষ্টি দেয়া হয় 'আইনী' প্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মধ্যে 'ক্ষমতা' সর্ম্পকের পদ্ধতিকে প্রকাশ করে। উপরের আলোচনায় আইনী নৃবিজ্ঞানের কতক বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমত ঃ আইন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সমাজ সাংস্কৃতিক আচার-আচরন, প্রথা ও মূল্যবোধের যৌগিক ফল। দ্বিতীয়ত ঃ আইনকে কতক কোডের ভিত্তিতে না দেখে সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে দেখা জরুরী।

আইনী নৃবিজ্ঞানের উপরোক্ত দৃষ্টিভংগীকে সামনে রেখে নিম্নে বাংলাদেশের ৩টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আইনী সহায়তার স্বরূপ তুলে ধরা হবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নারীর ক্ষমতায়ন কেন্দ্রীক আইনী ওকালতি মূলক (legal advocacy) কর্মকান্ড প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. 'আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান' ও নারীর 'ক্ষমতায়ন'

এ প্রবন্ধে 'আইনী নৃবিজ্ঞানের' পরিচিতি তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশে বেসরকারী আইনী সংস্থার কার্যক্রমকে 'আইনী নৃবিজ্ঞানের' আলোকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাদের (বেসরকারী আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান) কর্মকান্ডের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো নারীর 'অধিকার' অর্জন এবং 'ক্ষমতায়ন' নিশ্চিত করা। তাই 'ক্ষমতায়নের' স্বরূপ ও চর্চার পরিসর কিভাবে ব্যাপ্ত তা তুলে ধরা হলো।

উন্নয়ন ডিসর্কোসে 'ক্ষমতায়ন' বহুল আলোচিত প্রত্যয়। সরকার প্রধান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ও বিদ্যাজাগতিক পরিসরে এর ব্যাপ্তি। সাধারনভাবে 'ক্ষমতায়ন' বলতে বোঝানো হয় কোন কিছুর অর্জন, যার ফল হচ্ছে 'উন্নয়ন'। উন্নয়ন সংস্থাগুলো 'ক্ষমতায়ন' সম্পর্কিত উপস্থাপন এমনভাবে করে, যেন নারীর জন্য 'উন্নয়ন' দেবার একটি বিষয়। মনে করা হয় নারী ছিলো অনুৎপাদনশীল, জীর্ণ, শীর্ণ অবস্থার মধ্যে। পুরুষ থেকে 'ক্ষমতা' নিয়ে নারীকে 'ক্ষমতা' প্রদান করা হবে। সে মতে 'ক্ষমতা' প্রত্যয়টি অনেকটা পরিমাণগত (quantative), এখানে দেয়া নেয়ার সম্পর্ক অসম। তাই 'ক্ষমতায়ন' নারীর অর্জিত নয় বরং আরোপিত একটি বিষয়। এই বিশ্লেষণকে সামনে রেখে আমি বাংলাদেশের আইনী সহায়তাকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' (আসক), 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট' (ব্লাস্ট) এবং 'নারীপক্ষের' আইনী কর্মকান্ড কতক কেইসের মাধ্যমে তুলে ধরবো।

বাংলাদেশে আশির দশক থেকে শুরু করে আজ অব্দি যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নারীর 'ক্ষমতায়ন', প্রতিষ্ঠা করা ও 'ন্যায়বিচার' প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইনী সহায়তা দেয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' (আসক), 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট' (ব্লাস্ট) এবং 'নারীপক্ষ'[৯]। এই সংস্থাগুলি আইনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরীর ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ভাবেও সহায়তা প্রদান করে বলে দাবী করে। তাদের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো কাউন্সিলিং[১০] (counseling)। এরা দাবী করে আইনী পরামর্শ, সমঝোতা এবং সালিশী বিচারের মাধ্যমে মূলত দাম্পত্য বির্তকের মীমাংসা সম্ভব। যৌতুক, তালাক দেনমোহর আদায়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে যদি সালিশী বিচারের কোন মীমাংসা না হয় তবে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দেয়া হয়। অর্থাৎ সামাজিক জীবনে নানারূপ অস্থিরতা, কোন্দলকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে তা নিরসনের পথও তারা বাতলে দিচ্ছেন। এভাবে আইনী ডিসর্কোসকে প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষায় এই সংস্থাগুলি একভাবে এজেন্টরূপে কাজ করছে। কেননা এই সংস্থাগুলি টিকে থাকার পরিসর হলো "আইন বিষয়ক জ্ঞান"; যার মাধ্যমে সকল বিষয়ের প্রতি 'আইনী' মতামত দেবার ক্ষমতা অনুশীলন করে।

এ পর্যায়ে আমার গবেষণা উপাত্ত হতে বেসরকারী তিনটি আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির একটি করে কেইস পর্যায়ক্রমিক ভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো যার মধ্যে দুটি কেইস তাদের (বেসরকারী আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের) মতে 'সাফল্যজনক'। কেইস তিনটি তুলে ধরবার মাধ্যমে গবেষিত আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনী সহায়তা প্রদানের ধরণ তুলে ধরার মাধ্যমে পরবর্তীতে আইনী নৃবৈজ্ঞানিক ধারণায় ব্যাখ্যা দেয়া হবে।

কেইস - ১

'ক'[11] বিয়ে করে নিজের পছন্দে, স্বামী 'খ' এর অবস্থা বেশ ভালো তাদের নিজেদের বাড়ী আছে কামাঙ্গীরচরে কিন্তু 'ক'দের অবস্থা সেরূপ ভাল নয়; তার বাবা নৌকা চালায়। তবুও বিয়ের পর তারা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে মেয়ের সংসার সাজিয়ে দেবার কিন্তু ছেলেদের আকাঙ্খা বেশী ছিল। 'ক'র' মতে তার স্বামীর এ নিয়ে কখনোই কোন দাবি, আফসোস ছিলনা কিন্তু তার শ্বশুড়ী, ননদ, ভাসুর সর্বদাই তাকে নানা কথা শোনাত। এর মধ্যে সে সন্তান সম্ভাবা হলে তার স্বামীকে তার শ্বাশুড়ী মেয়ের বরের সাথে ব্যবসার জন্য জয়দেবপুরে পাঠিয়ে দেয়। সেই যে তার স্বামী গেছে আজ অবদি সে তার স্বামীকে দেখেনি।

'ক'র' ভাষ্যমতে "আমি আফাদের (আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী) বার বার বলছি যে আমার শ্বাশুড়ী, ভাসুরকে ধরে আইনে মাইর দেন বা তাদের নামে কেস দেন তাহলে আমার স্বামীর ঠিকানা আপনারা পাবেন। কিন্তু হেরা বলে আমার সাথে আমার স্বামীর সম্পর্ক; কেন সে ছেড়ে আমাকে চলে গেলো সেটা তাকেই বলতে হবে। এভাবে বছর চলে গেছে আমি আমার স্বামীকে আজও দেখতে পাইলাম না তাই এ রকম আইনের সাহায্যের দরকার নাই"।

স্বামী সম্পর্কে তার বিশ্বাস ছিল - "হেই মানুষটা বড় সোজা, সরল, আর মা'রে এত বিশ্বাস করে যে আমার মনে হয় হের মায়ে সত্য মিথ্যা কিছু বলছে আমার নামে, আর আমার মনে হয় মানুষটা দেশে নাই হেরে বাইরে কোথাও পাঠায় দিছে। তা নাহলে অল্পদিন হইলেও আমি তো সংসার করছি। ভালো মানুষ বইলাই বিশ্বাস কইরা আমাকে তার মার কাছে রাইখ্যা গেছে। আমি আর বিচার চাইনা। তাছাড়া নোটিশ পাঠাইলেও আমার ভাসুরে আমাদের হুমকী দিয়া যায়। কোন বাসায় এ অঞ্চলে আমারা বেশী দিন থাকতে পারিনা। থাক ! আমি বুইঝা গেছি আমার লগে আর তার দেহা হইত না। তাই আমি আর ঐহানে যামুনা।"

নিম্নে আইনী সংরক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাষ্য মতে 'সাফল্যজনক' একটি কেসের বিবরণ তুলে দেওয়া হলঃ

কেইস - ২

এক ইন্ড্রাস্ট্রিতে কর্মরত একজন নারী শ্রমিকের সাথে সেই ইন্ড্রাস্ট্রির একজন পুরুষ শ্রমিকের সম্পর্ক হয়। মেয়েটি ছিল গারো সম্প্রদায়ের, ধর্মান্তরিত হয়ে

> বিয়ে করে, কিন্তু বিয়ের পর জানতে পারে ছেলেটির আগের বউ আছে। তবুও মেয়েটির ইচ্ছা ছিল সংসার করার কিন্তু ছেলেটিকে প্রথম স্ত্রীর পক্ষ হতে চাপ দিতে থাকলে ছেলেটি মেয়েটিকে ডির্ভোস দেয়। সেক্ষেত্রে মেয়েটি দেনমোহরের জন্য ব্লাষ্টের কাছে আবেদন জানায়। ব্লাষ্টের সহায়তায় মেয়েটি দেনমোহরের ২০ হাজার টাকা সহ ডিভোর্স কার্যকরের তিন মাস সময়কালীন ১২ হাজার টাকা এবং ধর্মান্তরিত হবার জন্য ৪ হাজার টাকা বাবদ মোট ৩৬ হাজার টাকা পায়। এ কেইসটিকে ব্লাষ্ট একটি 'সাফল্যজনক' মীমাংসা হিসেবে দাবী করে।

নারীর ক্ষমতায়ন রক্ষায় আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান (নারীপক্ষ) নারীর পক্ষে পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখে (ভিন্ন করব নীল আকাশ, ১৩ই মে,২০০৩)। তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে 'হেল্পলাইন' নামক প্রজেক্টটি সর্ম্পকে বলা যায়, যার মূল লক্ষ্যই ছিল 'নারীর জন্য আইনগত পরামর্শ, মানসিক ও আইনগত সহায়তা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা'। আইনী অধিকার বাস্তবায়নে মৌখিকভাবে সহায়তা প্রদানকারী তাদের একটি প্রজেক্টের 'স্বার্থকতার' কেস নিম্নে তুলে ধরা হল:

> কেইস - ৩
>
> ঢাকার এক পরিবার কাজের মেয়ে[১২] তিন মাস রাখার পর তারা জানতে পারে মেয়েটি গর্ভবতী । তারা হেল্পলাইনের পরামর্শ চাইলে হেল্পলাইন তাদের স্বাগত জানায়, কারণ বিষয়টি নিয়ে তারা তাদের পরিবারের মধ্যে কোন অশান্তির সৃষ্টি করেনি বরং মেয়েটিকে নিয়ে চিন্তা করেছেন। সেক্ষেত্রে হেল্পলাইন মেয়েটিকে গর্ভবতী আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে বলেন। এর ফলে পরিবারটি হেল্পলাইনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গৃহকর্তা বলেন-- *"মেয়েটিকে নিয়ে আমরা বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম কারণ এরকম অবস্থায় তাকে তো বাসা থেকে বের করে দেয়া যায় না সেক্ষেত্রে হেল্পলাইনের এই সুপরামর্শকে স্বাগত জানাই"।* এই ঘটনাটিকে হেল্পলাইন তাদের 'সাফল্যকামী' একটি কেইস রূপে দেখেন।

কেইস তিনটি তুলে ধরবার মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এর ব্যাখ্যা এ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

৫. 'আইনী নৃবৈজ্ঞানিক' ধারণায়ন ঃ কেইস স্টাডির মাধ্যমে 'ক্ষমতায়নের' স্বরূপ

কেইস ১' এর প্রেক্ষিতে আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য হলো: *"যে স্বামী তার স্ত্রীর খোঁজ রাখে না এ রকম 'কর্তব্য বিমুখ', 'মেরুদন্ডহীন' স্বামীর সাথে সংসার করার কোন কারণ নেই। আর 'ক' তো তার স্বামীর সাথে সংসার করবে, তার*

শ্বাশুড়ির সাথে নয়, তাই শ্বশুর বাড়ী থাকার ও তার কোন প্রয়োজন নেই।" কিন্তু স্বামীর প্রতি 'ক'র' অগাধ বিশ্বাস বলে দেয় এ সমাজে নারীর কাছে প্রধান অবলম্বন তার স্বামী, সংসার। কেননা স্বামী ছাড়া বছর খানেক কেটে গেলেও 'ক' না পারছে তার স্বামীকে ভুলতে, না নতুন কোন সংসার গড়ে তুলতে। আমাদের সমাজে এখনও মেয়েরা শ্বশুর বাড়িকে বিয়ের পর তার বাড়ি বলে মানে এবং শ্বশুরবাড়ীতে বসবাস করাকে সম্মানজনক মনে করে। 'ক' ও সেই মূল্যবোধে শ্বশুর বাড়ি থাকতে চাইলেও তার স্থান সেখানে নেই। এ অবস্থায় 'আইন' 'ক'র' অভাবী বাবা মার সংসারে দুইজনের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া বিশেষ কোন ভূমিকা তাদের পরিবারে রেখেছে বলে মনে হয়না।

অধিকার রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ধারণার মূলে থাকে- কিছু মানুষ 'পশ্চাৎপদ', তবে তাদের 'ক্ষমতায়ন' সম্ভব নিজ আইনী অধিকার সম্পর্কে জানার মাধ্যমে। এখানে ধরেই নেয়া হয় দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পক্ষে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন বা নিজেদের কথা বলার মত ক্ষমতা নেই আর তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য উন্নয়ন কর্মীদের সাহায্য প্রয়োজন। যা এই কেইসেও দেখা যায়, ফলে আইনী সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া কোন ভাবেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি হিসেবে একজন নারীর আকুলতাকে বোঝেনি বরং তাকে বোঝান হয় তার প্রতি স্বামীর কর্তব্যহীনতাকে, সে পর্যায়ে এ সমস্যার দিক নির্দেশনা হয় আইনী মাধ্যমে সমাপ্তি করা অর্থাৎ 'ডির্ভোস' দেয়া।

২ নং কেইসের ক্ষেত্রে বলা যায়, একজন গারো নারী যে নিজের গোত্র ধর্ম পরিচয় সব বিসর্জন দিয়ে মুসলিম বাঙ্গালী পুরুষটিকে বিশ্বাস করে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা একভাবে আত্মপরিচয় হারাবার মাধ্যমে নতুন সত্ত্বা নির্মাণ করে। কিন্তু যখন সেই স্বামী নানাভাবে তার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে তখনও কিন্তু সে সব জেনেও স্বামীকে ছাড়তে চায়নি। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও এক স্বামী নিয়ে সারাজীবন সংসার করবার ব্রতী পালন করে থাকে আর সেক্ষেত্রে সংসার করা তাদের কাছে ধর্ম পালনের সমান। এ পর্যায়ে ব্লাস্ট নারীটিকে দেনমোহরের টাকা আদায় সহ ধর্মান্তরিত হবার জন্য তাদের ভাষায় 'ক্ষতিপূরণ' রূপে কিছু টাকা আদায় করে দেয়। প্রশ্ন হল এই কি নারীটির দাবী ছিল, যার মাধ্যমে সে তার নিজস্ব আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারত ? শুধু কতগুলো টাকাই কি একজন নারীকে 'ক্ষমতায়িত' করে ?

কেইস ৩ এ, গর্ভবতী কাজের মেয়েটি একজন শ্রমিক। যে কাজ করতে এসে নিপীড়নের স্বীকার হলেও তার এই দূরাবস্থার জন্য কাউকে দায়ী করেনি। সেক্ষেত্রে যখন তার মালিক তাকে নিয়ে নয়; বরং তার উপস্থিতির কারণে সমাজে তাদের

জবাবদিহিতার প্রশ্ন আসবে সে কারণে হেল্পলাইনের কাছে পরামর্শ চাইলে হেল্পলাইন পরিবারটিকে রক্ষা করার জন্য একটি আশ্রয়পূর্ণ স্থানে মেয়েটিকে সরিয়ে দেবার পরামর্শ দেন। এ পর্যায়ে জিজ্ঞাসা হল হেল্পলাইনের এরূপ পরামর্শ কি ঐ গর্ভবতী মেয়েটিকে 'ক্ষমতায়িত' করে নাকি ঐ পরিবারটিকে। আইনী সহায়তাকারী সংস্থা গুলো যেভাবে 'ক্ষমতায়নকে' বিবেচনা করছে তাতে 'ক্ষমতায়নের' অর্থই দাঁড়ায় 'ক্ষমতা' দেবার কোন বিষয় এবং এর প্রক্রিয়া হচ্ছে 'বাইরের' কোন শক্তির। সে অর্থে 'ক্ষমতা' এক ধরনের 'জিরো-সাম গেইম' এর মতো।

৬. উপসংহার ও মন্তব্য

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আইনী কাঠামোর ভিত্তিতে যেভাবে নারীকে 'ক্ষমতায়িত' করার কথা বলে তা আমাদের সমাজের নারীর আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি নয়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড এবং ব্যক্তি জীবনে 'ক্ষমতায়ন' পৃথক ভাবে উপস্থিত। নারীর কাছে প্রধান তার সংসার, স্বামী সেখানে নানা যন্ত্রনা, কষ্ট, নিপীড়ন থাকলেও নারীরা সর্বদা তা মোকাবেলার মাধ্যমে নিজ সংসার টিকিয়ে রাখতে চায়। নারীর 'ক্ষমতায়ন' বুঝতে হলে নির্দিষ্ট সামাজিক বাস্তবতায় নারীর আকাঙ্খাকে বুঝতে হবে। কিন্তু আইনী অধিকার রক্ষাকারী (প্রায়) সকল এনজিওগুলোর মতে - 'নারী যেন স্থির কোন সত্ত্বা ' যার নিজস্বতা বলে কিছু নেই। এরা আইনকে ব্যবহার করে একটি ভিন্ন মতাদর্শ নির্মাণ করতে চায়। এটি সহজে বোঝা যায় বেসরকারী আইনী সহায়তাকারী কর্মসূচীগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে, যেখানে এরা আইনী সহায়তাকামী নারীদের প্রকাশ করে কখনো "ক্লায়েন্ট", আবার কখনো "ভিকটিম", কখনো বা "স্থবির" রূপে[১৩]। ভাষাগত ব্যবহারে তাদের এই ক্যাটাগেরি তৈরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে উত্তরদাতাদের অসম ক্ষমতার সর্ম্পকের বর্হিঃ প্রকাশ ঘটে। যার ফলে "ক্ষমতায়ন" একটি বাগড়াম্বর হিসেবে প্রকাশ পায়।

এই প্রবন্ধের অন্যতম যুক্তি হচ্ছে আইন কোন ভাবেই অধিকার নিশ্চিত করণের একক হতে পারেনা। নারী তার নিজ অধিকার জানার মাধ্যমে "আইনী সহায়তায় প্রতিরোধ করতে পারছে", "অধিকার অর্জিত হচ্ছে" এরূপ বয়ান কেবল 'উন্নয়ন' বার্তায় স্থান পায় যার সাথে নির্দিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিকতা ও মতাদর্শের সম্পর্ক অসম। বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীদেরকে সংসারের যাবতীয় বোঝা বহন করতে হয়। তাই বলে নারী গৃহস্থালীতে থাকায় তার সত্ত্বা আবদ্ধ নয়। আবার নারী কোন সমস্বত্ত্ব এককও নয়। নারীর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, বিবেক, চেতনা, জ্ঞান তার পরিবেশ পরিস্থিতি ভেদে সে প্রয়োগ করে থাকে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আইনী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর অধিকার অর্জন প্রশ্নে সালিশ করে থাকে, তাতে নারীর দেনমোহর আদায়করন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তাও আবার নির্দিষ্ট অনুপাত থেকে কম এবং মাসিকহারে। আমার গবেষণা তথ্য দেখাচ্ছে যে, নারীর জীবনে 'উন্নয়ন' বা পরিবর্তন প্রশ্ন সাপেক্ষ। স্বামীর ঘর করবার অতৃপ্ত বাসনা সর্বদাই তাদের কাজ করেছে। এই সাংস্কৃতিক মতাদর্শের (cultural ideology) অর্ন্তনিহিত অর্থ (meaning) না বুঝলে কেবল আইনের মাধ্যমে 'ক্ষমতায়ন' বিষয়টি সমস্যায়িত রূপে থেকেই যাবে। 'আইনী নৃবিজ্ঞান' 'আইন'কে সমাজ, সংস্কৃতি উদ্ভূত প্রথা ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শ উৎসরিত বিষয় হিসেবে দেখতে আমাদের উৎসাহিত করে। কেননা আইনের দৃষ্টিভঙ্গী যান্ত্রিক ও স্থির। তাই আইনী কোডের উর্ধ্বে থেকে প্রাত্যহিক জীবনে অনুশীলিত নিয়ত পরিবর্তনশীল আইনকে বোঝার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

টীকা

১. এই প্রবন্ধটি আমার তৃতীয় বর্ষের পবেষণাপত্র "নারীর ক্ষমতায়ন: ঢাকা শহরের তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আইনী সহযোগীতার ডিসর্কোস" আলোকে লিখা। গবেষণাটি ঢাকা শহরের তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যেমন- 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' (আসক), 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট' (ব্লাস্ট) এবং 'নারীপক্ষে' মাঠকর্মের ভিত্তিতে পরিচালিত। 'আইনী নৃবিজ্ঞানের' আলোকে নারীর 'ক্ষমতায়ন' বিষয়টি এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে। (বিস্ত ারিত দেখুন, নাহার নাসরিন (১৯৯৮-৯৯) "নারীর ক্ষমতায়ন: ঢাকা শহরের তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আইনী সহযোগীতার ডিসর্কোস" নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনপর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)। প্রবন্ধটি তৈরী করার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক বর্তমানে সহকর্মী ডঃ জহির আহমেদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

২. নারীর 'ক্ষমতায়ন' (*empowerment)* একটি সমস্যায়িত প্রত্যয় বলে অনেক পবেষক মনে করেন। কারণ 'ক্ষমতায়ন' কেবল অর্থনৈতিক বা আইনী লড়াইয়ে জয়ী হওয়াকে বোঝায় না। বরং 'ক্ষমতায়ন' গৃহস্থালী অভ্যন্তর ও বাইরে নারীর অবস্থান, মর্যাদা ও স্বত্ত্বা কিভাবে পুরুষতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শের কারণে অবদমিত থাকে তা প্রশ্ন স্বাপেক্ষ। (বিস্তারিত দেখুন *Gardnar, Kate and Lewis, David (1996) , Hashemi, S. M., Schuler, S. R. and Riley, A. P. (1996)., Kabeer, Naila (1994)*.

৩. মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ প্রাকৃতিক আইনকে ঈশ্বরের বিধানরূপে প্রচার করত। প্রাকৃতিক আইন সার্বভৌমের আদেশ নয়। এর পেছনে রাষ্ট্রের অনুমোদনও থাকেনা। এই আইন সহজাত ও অবাধ; মানুষের ন্যায়বোধ ও সচেতনতার উপর এই আইন প্রতিষ্ঠিত।

৪. দেখুন, *Barnard, A and Spencer, J.eds (1996) 'law' ; Enclopedia of Social and Cultural Anthropology, London and Newyork, Routledge –(p:-330-331).*

৫. দেখুন, নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ (২০০৪) "*Law,Legal Pluralism and Human Rights: Towards an Understanding of 'Anthropology of Law'*, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা-৯; নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৬. স্যার হেনরি মেইন ১৮৬১ সালে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনতত্ত্বের শিক্ষক ছিলেন। তার লিখিত (*Ancient Law*) উপনিবেশিক সময়কালীন আইনী বিষয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেখানে তিনি বিভিন্ন আইনী ঐতিহ্যের বর্ণনা ও অর্ন্তভূক্ত করেছেন। মেইনের কাজে মানব সমাজের আইনী ভাবধারার বিবর্তনিক মডেল দেখা যায় যেখানে সুদূর আদিম সমাজ হতে ইংল্যান্ডে ভিক্টোরিয়ান যুগে আইনী ধারণার আলোচনা স্থান পায়।

৭. 'নাগরিক আইন' যা সামাজিক কাঠামোর বিধিবিধানের অর্ন্তগত আর 'অপরাধ আইন' বলতে বোঝানো হয় সামাজিক নিরাপত্তার জন্য তৈরী কৃত আইন।

৮. দেখুন, *Richard A. Wilson (1979) : Human Rights, Culture And Context: An Introduction; Human Rights, Culture And Context-Anthropological Perspectives- (p:1-5)*.

৯. এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। তাদের কাজের পরিসরও ভিন্ন। আইন সহায়তার দৃষ্টিভংগী মোটামুটি ভাবে একই। বেসরকারী এই তিনটি আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভিন্নতা মনে হলেও আইন সহায়তা দেবার পুরো প্রক্রিয়াই আরোপণ।

১০. 'আইনী সহায়তায়' বেসরকারী তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'কাউন্সিলিং' প্রশ্নে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' মনে করে- ' ব্যক্তি প্রাথমিক অবস্থায় দিকবিদিক শূণ্য থাকে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে তার 'কাউন্সিলিং' আবশ্যক। 'নারীপক্ষ' (২০০০) সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় 'হেল্পলাইন' নামক প্রজেক্টের মাধ্যমে টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি 'কাউন্সিলিং' করে থাকে। 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট' (ব্লাস্ট) 'কাউন্সিলিং' এর মাধ্যমে ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের চেষ্টা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে তাদের জুনিয়র ষ্টাফ ল'ইয়ার বলেন: " আমরা, দাম্পত্য অভিযোগে সালিশী বিচারে পরপর তিনবার চিঠি দেই, কোন উত্তর না পেলে মামলায় যাই, কিন্তু মেয়েরা সহজে ডির্ভোস দিতে চায় না, তারা চায় সংসার করতে তাই 'কাউন্সিলিং' করে কিছু হয়না।

১১. প্রতিষ্ঠানের এই 'কেইসগুলি' অত্যন্ত গোপনীয়, যার কারণে গবেষিতদের নামের ক্ষেত্রে প্রতিটি কেইসে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে গবেষিত নারীর নামের পরিবর্তে 'ক' এবং তাদের স্বামীর নামের ক্ষেত্রে 'খ' ব্যবহৃত হয়েছে।

১২. বাসা বাড়ীতে গৃহস্থ কাজে সহায়তাদানকারী নারী শ্রমিককে বলা হয় 'কাজের মেয়ে'।

১৩. গবেষণায় বেসরকারী তিনটি আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকার কালে সর্বদাই লক্ষ্যনীয় যে, তাদের কাছে আইনী সহায়তাকামী ব্যক্তিটি তার 'ক্লায়েন্ট' যে 'ভিকটিমের' স্বীকার যাকে তারা 'সার্ভিস প্রোভাইড' করছে। গবেষণায় গোপনীয়তার স্বার্থে সাক্ষাৎকারীদের নাম অনুল্লেখিত রাখা হলো।

তথ্যপঞ্জী

- Barnard and S. Jonathan (1989) 'Law': Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. (ed.) Routledge, London and New York.
- Fitzpatrick, P. (1996) 'Sociology of Law and Crime': The Mythology of Modern Law, Oxford: Clarendon Press.

- Gardnar, Katy and Lewis, David (1996) Anthropology, Development and the Post-Modern Challenge, London: Pluto Press.
- Hashemi, S. M., Schuler, S. R. and Riley, A. P. (1996) Rural Credit Programmes and Women's Empowerment in Bangladesh.
- Kabeer, Naila (1994) Reversed Realities: Gender Hierarchies and Development, London: Verso.
- Kuppe Rene And Potz Richard, (1996) law of Anthropology;

  International Yearbook for legal Anthopology, Vol-8, Martinus Nijhoff publishers.
- Lawrence Rosen, (1996) Law as a Cultural in Islamic Society: The Anthropology of Justice, Chicago: University of Chicago Press.
- National Policy Review Forum (2003) Task Force Report on 'Gender Equality and Women's Empowerment'. CPD, June 3-5, 2003, Dhaka, Bangladesh.
- White, Sarah, C(1990) Woman and Development: A New Imperialist Discourse. In Journal of Social Studies, 48:90-111(1991) Evaluating the Impact of NGOs in Rural Poverty Alleviation: Bangladesh Country Study, London: Overseas Development Institute.
- Wilson A.Richard (1979) Human Rights, Culture and Context: An Introduction (1-25), Human Rights, Culture and Context-Anthropological perspectives. Cambridge University Press.
- ব্লাস্ট বুলেটিন (ডিসেম্বর ২০০৩), ৪র্থ সংখ্যা, ২য় বর্ষ।
- নারীপক্ষ (২০০১) একটি পর্যালোচনা : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন।
- নারীর ক্ষমতায়নঃ ঢাকা শহরে তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আইনী সহযোগীতার ডিসকোর্স; নাহার নাসরিন, বি.এস.এস শিক্ষাবর্ষ (১৯৯৮-১৯৯৯), নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
- নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ (২০০৪) "*Law,Legal Pluralism and Human Rights: Towards an Understanding of 'Anthropology of Law'*, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা-৯; নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
- হারুন, অবন্তী ও নাহার, আইনুন (২০০০) 'গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের মিথঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'; চর্চা (৬৫-৯৪) নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধ সংকলন।